রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব

ইউনিট ৩

বাঙালি তথা বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস সরল রৈখিক নয়। স্বাধীনতাকামীদেরকে কখনও মোকাবেলা করতে হয়েছে বিদেশীদের; আবার কখনো বা দেশীয় চক্রের। বাঙালির ইতিহাসের মধ্যে রয়েছে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে অদম্য আন্দোলনের ইতিহাস, পাকিস্তানী শাসক চক্রের বিরুদ্ধে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের গৌরবময় গাঁথা, যা পেয়েছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার স্বীকৃতি, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সাহসী ইতিহাস ইত্যাদি। বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে স্বাধীনতা অর্জন করে। এই স্বাধীনতা আন্দোলনের বীজ বপন করা হয়েছে দীর্ঘকাল পূর্বেই। পলাশীর প্রান্তরে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের পর ব্রিটিশরা এদেশের মানুষকে পরাধীনতার শিকলে বেঁধে ফেলে। সে শিকল ভাঙ্গার জন্য যুগের পর যুগ বরেণ্য ব্যক্তিরা লড়াই-সংগ্রাম করেছে। এ ইউনিটে এ ধরনের কয়েকজন সংগ্রামী ব্যক্তিত্বের জীবন, কর্ম ও অবদান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১: হাজী শরীয়তুল্লাহ্
পাঠ-২: শহীদ তিতুমীর
পাঠ-৩: নওয়াব আবদুল লতিফ
পাঠ-৪: দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ
পাঠ-৫: নবাব স্যার সলিমুল্লাহ
পাঠ-৬: শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক
পাঠ-৭: মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী
পাঠ-৮: হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
পাঠ-৯: মাস্টারদা সূর্যসেন
পাঠ-১০: নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু
পাঠ-১১: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

পাঠ-৩.১ হাজী শরীয়তুল্লাহ্ (১৭৮১-১৮৪০)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- হাজী শরীয়তুল্লাহ্র জীবন বৃত্তান্ত জানতে পারবেন।
- হাজী শরীয়তুল্লাহ্র আদর্শ সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- হাজী শরীয়তুল্লাহ্র অবদান নিরুপণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	পরাধীনতা, মুসলিম সম্প্রদায়, ঐক্যবদ্ধ, ওয়াহাবি মতবাদ, ফরায়েজি

১৭৫৭ সালে পলাশীতে নবাব সিরাজ উদ্দৌলার পরাজয়ের পর ব্রিটিশরা এদেশের মানুষকে পরাধীনতার শিকলে বেঁধে ফেলে। শিকল ভাঙ্গার কাজটি করার জন্য যুগের পর যুগ যে সব ব্যক্তি লড়াই-সংগ্রাম করে গেছেন হাজী শরীয়তুল্লাহ তাদের মধ্যে একজন। হাজী শরীয়তুল্লাহ্ই প্রথম উপলব্ধি করেন যে ব্রিটিশ শোষণ ও উৎপীড়নের কবল থেকে রেহাই পেতে হলে এখানকার মুসলিম সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ শক্তিরূপে দাঁড়াতে হবে। আর এ কারণে ফরায়েজি ও ওয়াহাবিদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি একটি ইসলামী সংস্কার আন্দোলনের ডাক দেন। হাজী শরীয়তুল্লাহ্র আদর্শের প্রতি নিম্নবিত্ত মুসলমান পেশাজীবী শ্রেণীসমূহ আকৃষ্ট হয়। দরিদ্র রায়ত, কৃষক, তাঁতী ও তেলী সম্প্রদায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর পতাকাতলে জড়ো হয়।

হাজী শরীয়তুল্লাহ্র জীবন বৃত্তান্ত

হাজী শরীয়তুল্লাহ ১৭৮১ সালে ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর মহকুমার অন্তর্গত শামাইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তাঁর নামানুসারে শরিয়তপুর জেলার নামকরণ করা হয়েছে। মাত্র আট বছর বয়সে পিতাকে হারানোর পর চাচার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হন শরীয়তুল্লাহ্। কলকাতা ও হুগলীতে প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর তিনি আঠারো বছর বয়সে মক্কা গমন করেন। তিনি দীর্ঘ বিশ বছর মক্কায় অবস্থান করেন। সেখানে অবস্থানকালে তিনি ওয়াহাবি মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। ওয়াহাবি মতবাদের ভিত্তিতেই হাজী শরীয়তুল্লাহ্ তাঁর সংস্কারমূলক আন্দোলন শুরু করেন। সমাজ ও ধর্মীয় সংস্কারমূলক এই আন্দোলন এক পর্যায়ে অত্যাচারী জমিদারদের শোষণ হতে কৃষকদের মুক্ত করার লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। হাজী শরীয়তুল্লাহ্র আন্দোলন পরবর্তীতে 'ফরায়েজি আন্দোলন' নামে পরিচিতি পায়। ফরায়েজি আন্দোলনের মাধ্যমেই তিনি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে আমৃত্যু সোচ্চার থাকেন। ১৮৪০ সালে শরীয়তুল্লাহ মৃত্যুবরণ করলে, পুত্র দুদু মিয়া ফরায়েজিদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

হাজী শরীয়তুল্লাহ্র অবদান

ফরায়েজি মতাদর্শ: হাজী শরীয়তুল্লাহ তৎকালীন আরবের ওহাবিদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের মানসে একটি ইসলামী সংস্কার আন্দোলনের ডাক দেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে বিদেশী "বিধর্মীদের" রাজত্বে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ সম্ভব নয়। তিনি মনে করেন উৎপীড়নের কবল থেকে রেহাই পেতে হলে মুসলিম সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ শক্তিরূপে দাঁড়াতে হবে। এ জন্য ইসলাম ধর্মের অবশ্য পালনীয় কর্তব্যসমূহ কার্যকর করতে হবে। আল্লাহ কর্তৃক নির্দেশিত অবশ্য পালনীয় ধর্মীয় কর্তব্যসমূহকে ফরজ বলা হয়। শরীয়তুল্লাহ মুসলমানদের স্থানীয় লোকাচার পালনের বিরোধী ছিলেন। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে, অবশ্য পালনীয় ধর্মীয় কর্তব্যসমূহকে কার্যকর করতে হাজী শরিয়তউল্লাহ ফরায়েজি মতাদর্শ প্রতিষ্ঠিত করেন।

সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব: হাজী শরীয়তুল্লাহ ধর্মীয় চিন্তার পাশাপাশি মুসলিম সমাজ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে মুসলিম সমাজে অসাম্য ও বর্ণ বা শ্রেণীভেদের কোন জায়গা নেই।

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, ফরায়েজি আন্দোলন ইসলামী ধর্মের ভিত্তিতে হলেও এক পর্যায়ে এসে এটি একটি রাজনৈতিক প্রতিরোধ আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে নীলকর ও জমিদারদের উৎপীড়নে মুসলমান কৃষক সম্প্রদায় যখন জর্জরিত তখন এই সম্প্রদায়কে সংঘবদ্ধ ও সুসংহত শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য হাজী শরীয়তুল্লাহ্ উদাত্ত আহবান জানান।

শিক্ষার্থীর কাজ	ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে হাজী শরীয়তুল্লাহ্র অবদান আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

ওয়াহাবি মতবাদে দীক্ষিত হাজী শরীয়তুল্লাহ বাংলার দরিদ্র মুসলমান কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষকে ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসকের জুলুম থেকে বাঁচানোর সংগ্রাম করেন। শরীয়তুল্লাহ উপনিবেশের বিরুদ্ধে লড়াইকে ধর্মীয় শুদ্ধতাবাদের সাথে যুক্ত করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। হাজী শরীয়তুল্লাহ কোন মতবাদে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন?

(ক) শিয়া (খ) সুন্নি

(গ) সুফি (ঘ) ওয়াহাবি

২। ফরায়েজি আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল–

i. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

ii. মুসলমানদের ধর্মমুখী করা

iii. শাসকদের অত্যাচারের প্রতিবাদ করা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩। হাজী শরীয়তুল্লাহ কোন জেলায় জন্মগ্রহণ করেন?

(ক) ঢাকা (খ) চট্টগ্রাম

গ) ফরিদপুর ঘ) মাদারীপুর

পাঠ-৩.২ শহীদ তিতুমীর (১৭৮২-১৮৩১)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- শহীদ তিতুমীরের জীবন বৃত্তান্ত জানতে পারবেন।
- শহীদ তিতুমীরের চিন্তা-চেতনা জানতে পারবেন।
- শহীদ তিতুমীরের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি সম্পর্ক দেখতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সংস্কার, প্রতিরোধ পর্ব, নীলকর, জমিদার. ধর্মসংস্কারক, বাঁশের কেল্লা।

স্থানীয় জমিদার ও নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ শাসনের প্রাথমিক পর্বে প্রতিরোধ গড়ে তোলা অন্যতম এক নাম তিতুমীর। নিম্নবর্গের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে বাংলাকে ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত করার সাহসী এক লড়াই গড়ে তুলেছিলেন তিতুমীর।

শহীদ তিতুমীরের জীবন বৃত্তান্ত

শহীদ তিতুমীরের প্রকৃত নাম সাইয়িদ মীর নিসার আলী। ১৭৮২ খ্রীস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসাত মহকুমার অন্তর্গত চাঁদপুর (মতান্তরে হায়দারপুর) গ্রামে তিতুমীর জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলাই তাঁর চরিত্রে দুটি বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ ঘটেছিল। একদিকে তিনি ছিলেন ধর্মপ্রাণ,সত্যনিষ্ঠ ও অপরদিকে অসমসাহসী। গ্রামের মক্তবে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে তিতুমীর স্থানীয় এক মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেন। আরবি ও ফারসি সাহিত্যে একদিকে যেমন তাঁর ছিল দক্ষতা, অপরদিকে ছিল গভীর অনুরাগ। তিনি ইসলামি শাস্ত্রে পন্ডিত ছিলেন। মাদ্রাসায় অধ্যয়নকালে তিতুমীর একজন দক্ষ কুস্তিগীর হিসেবেও খ্যাতি অর্জন করেন। বিশিষ্ট মল্লবীর হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল বলে তিনি নদীয়ার জমিদারের লাঠিয়াল বাহিনীর অধিনায়ক পদ লাভ করেন। পরবর্তীতে তিনি ঔপনিবেশিক শাসন ও জমিদার শ্রেণীর উৎপীড়নে বিপর্যস্ত মুসলমান জনসাধারণের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য চেষ্টা এবং ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে নিজেকে নিয়োজিত করেন। তিতুমীর ১৮৩১ সালের ১৯ নভেম্বর নারকেলবাড়িয়ায় ইংরেজ বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শহীদ হন।

চিন্তা-চেতনার বিকাশ

ছোটবেলা থেকেই আরবি ও ফারসি সাহিত্যে তিতুমীরের বেশ দক্ষতা ছিল। ১৮২২ সালে চল্লিশ বছর বয়সে তিতুমীর হজব্রত পালনের জন্য মক্কা শরীফ যান এবং সেখানে বিখ্যাত ইসলামি ধর্মসংস্কারক ও ওয়াহাবি আন্দোলনের নেতা সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর সান্নিধ্য লাভ করেন। ১৮২৭ সালে মওলানা বেরেলভীর মতাদর্শে দীক্ষাগ্রহণের পর তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে ইসলাম ধর্মের প্রচারকার্যে আত্মনিয়োগ করেন। তিতুমীর মনে করতে শুরু করেন যে, ইসলামকে তার পূর্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে প্রথমত ইসলামী জীবন ব্যবস্থা কায়েম করতে হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁর আন্দোলনের লক্ষ্য সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার হলেও, তা ধীরে-ধীরে নীলকর, অত্যাচারী জমিদার এবং সর্বোপরি ব্রিটিশ শাসন থেকে বাংলার মানুষকে মুক্ত করার আন্দোলনে রূপ নেয়।

তিতুমীরের অবদান

তিতুমীরের সংগ্রাম একদিকে ছিল ঔপনিবেশিক শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে, অপরদিকে ছিল শোষক শ্রেণী অর্থাৎ জমিদার ভূ-স্বামীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম। তিতুমীর যখন থেকে বিদেশী আধিপত্যমুক্ত সমাজব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য সক্রিয় হয়ে ওঠেন, ঠিক তখনই ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী ও দেশীয় শোষক-উৎপীড়ক শ্রেণী তাঁর পথে বাধা সৃষ্টি করতে থাকে। এমতাবস্থায়, সাহসী তিতুমীর কায়েমী স্বার্থচক্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন এবং প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। উন্নত রণকৌশল ও মারণাস্ত্রে সুসজ্জিত ইংরেজ বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য, তিতুমীর ১৮৩১ সালের অক্টোবর মাসে

নারকেলবাড়িয়ায় এক বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন। এ পর্যায়ে তিতুমীর নিজেকে 'বাদশা' ঘোষণা করেন। নভেম্বর মাসের মাঝামাঝিতে ইংরেজ বাহিনী তিতুমীরের বাহিনীর উপর আক্রমণ চালায়। ১৯ নভেম্বও তিনি শহীদ হন।

শিক্ষার্থীর কাজ	তিতুমীরের জীবন বৃত্তান্ত বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের প্রথম দিককার অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব তিতুমীর। উপনিবেশিক শাসক ও তাদের দেশীয় চক্রের বিরুদ্ধে তিতুমীরের লড়াই আমাদের ইতিহাসের এক অনন্য অধ্যায়। ১৮৩১ সালের নভেম্বরে তিতুমীর নারকেলবাড়িয়ায় বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করে ব্রিটিশ প্রতিরোধ লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন। অসম এই লড়াইয়ে তিতুমীর শহীদ হন। তিতুমীরের এই প্রতিরোধ লড়াই বাঙালির জন্য এক অপরিসীম অনুপ্রেরণার উৎস।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাঁশের কেল্লা কে নির্মাণ করেছিলেন?

(ক) স্যার সলিমুল্লাহ (খ) নওয়াব আবদুল লতিফ

(গ) শহীদ তিতুমির (ঘ) সৈয়দ আহমেদ

২। তিতুমির ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে শহীদ হন। তাঁর আন্দোলনের মূলধারা কী ছিল?

(ক) হিন্দুদের দমন করা (খ) ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা

(গ) অর্থ উপার্জন করা (ঘ) ইংরেজ শাসন প্রতিরোধ করা

৩। তিতুমিরের আন্দোলনের সাথে জড়িত–

i. শিক্ষা বিস্তারে অনুকূল চেতনা সৃষ্টি

ii. জমিদার ও নীলকরদের বিরোধিতা

iii. ইংরেজ শাসন বিরোধীতা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) ii ও iii

(গ) i ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৩.৩ নওয়াব আবদুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- নওয়াব আবদুল লতিফের আদর্শ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- নওয়ার আবদুল লতিফের জীবন বৃত্তান্ত বলতে পারবেন।
- নওয়ার আবদুল লতিফের রাজনৈতিক চিন্তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সহযোগী, নীলকর, মুসলিম সমাজ, সংস্কার

ঊনিশ শতকে বাংলার ধ্বংসোন্মুখ মুসলিম সমাজের পুনরুজ্জীবনের কাজে যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন নওয়াব আবদুল লতিফ খান বাহাদুর ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ফরায়েজি ও ওয়াহাবি আন্দোলনের সাথে দ্বিমত পোষণ করতেন। নওয়াব লতিফ বুঝতে পেরেছিলেন যে, সংগ্রামের পথে গিয়ে নয় বরং ইংরেজি শিক্ষাগ্রহণ ও ইংরেজ রাজশক্তির সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে মুসলিমদের পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। আর তাহলেই এ জনপদের মুসলিম সমাজের একদিন মুক্তি ঘটবে। প্রকৃতপক্ষে, আবদুল লতিফ স্বদেশের রাজনীতিক স্বার্থে এই জনপদের বিভিন্ন সম্প্রদায়কে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করতে সদা সচেষ্ট থেকেছেনও বটে। আমরা যদি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পিছনের অনুঘটকগুলোকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করি, তাহলে দেখব যে বঙ্গবন্ধুসহ অন্যান্য নেতৃত্বের মধ্যে উদার গণতন্ত্র, সংসদীয় ব্যবস্থা, স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন ইত্যাদি পাশ্চাত্য ব্যবস্থা সম্পর্কিত ধারণা প্রবলভাবে রয়েছে। তাঁরা এটা বিশ্বাস করতেন যে, এ সকল ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মধ্যেই এ অঞ্চলের মানুষের মুক্তি আসবে। আর এ উদার গণতন্ত্র, সংসদীয় ব্যবস্থা, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ইত্যাদি মতাদর্শ ও শাসনব্যবস্থার সাথে মুসলিম সমাজের পরিচয় ঘটানোর জন্য নবাব আব্দুল লতিফ সারাজীবন অক্লান্ত প্রয়াস চালিয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে এবং ব্রিটিশ সরকার ব্যবস্থার কাছাকাছি থেকেই এ জনপদের পিছিয়ে পড়া মুসলিম সমাজের মধ্যে আধুনিকায়ন প্রক্রিয়া বহমান করা সম্ভব। বস্তুত এ অঞ্চলে মুসলিম সমাজে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি হিসেবে গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে নবাব আবদুল লতিফের অবদান অনেক।

নওয়াব আবদুল লতিফের জীবন বৃত্তান্ত

নওয়াব আবদুল লতিফ ১৮২৮ সনে ফরিদপুর জেলার রাজাপুরে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। আবদুল লতিফের বাবা ছিলেন একজন আইনজীবী। সচেতন মানুষ হিসেবে লতিফের বাবা ছেলেকে আরবির সাথে সাথে ইংরেজি ভাষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে কলকাতা মাদ্রাসায় ভর্তি করেন। কলকাতা মাদ্রাসায় উচ্চ শিক্ষালাভের পর মাত্র উনিশ বছর বয়সে এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা শুরু করেন। পরবর্তীতে তিনি ১৮৪৯ সালে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন। তিনি ছিলেন প্রথম সরকারি আমলা যিনি নীলকরদের অত্যাচারের হাত থেকে নীল চাষীদের রক্ষায় এগিয়ে আসেন। আবদুল লতিফ বিভিন্ন সময়ে সরকারের বিভিন্ন পদে চাকরি করেছেন। এছাড়াও তিনি ভুপালের নবাবের দরবারে কিছুকাল প্রধানমন্ত্রীর পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৮৮৪ সালে সরকারি চাকরি থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৯৩ সালের ১০ জুলাই নওয়াব আবদুল লতিফের জীবনাবসান হয়।

নওয়াব আবদুল লতিফের রাজনীতি চিন্তা

রাজনৈতিক পদ্ধতি বিষয়ে আবদুল লতিফ যে পথ নির্দেশ করেছেন, তা পূর্ববর্তী মুসলিম ধর্মীয়-সামাজিক নেতৃবৃন্দের অনুসৃত পদ্ধতি থেকে স্বতন্ত্র। তিনি প্রতিরোধ ও সংগ্রামের পথ বর্জন করে আপোষ ও সহযোগিতার পথে লক্ষ্য অর্জনে বিশ্বাসী ছিলেন। মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি ইংরেজ সরকারের বিরূপ মনোভাব বুঝতে পেরে তিনি ব্যথিত হন। এ বিরূপ মনোভাব প্রশমিত করার জন্যে তিনি মোটামুটিভাবে তিনটি লক্ষ্য স্থির করেন। লক্ষ্য তিনটি হচ্ছে-

ক) মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি ইংরেজ সরকারের বিদ্বেষভাব দূরীকরণ

খ) মুসলিম সমাজের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ
গ) হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রী প্রতিষ্ঠা

নওয়াব আবদুল লতিফের উপরোক্ত পদক্ষেপগুলি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে যে, তিনি মূলত ইংরেজ সরকারের সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে মুসলিম সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক মুক্তি এবং হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রী প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার তাগিদ দিয়েছেন।

আবদুল লতিফ বুঝতে পেরেছিলেন যে, ইংরেজি শিক্ষাগ্রহণ ও ইংরেজ রাজশক্তির সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে প্রথমে মুসলিমদের পুনরুজ্জীবিত করতে না পারলে, এ জনপদের মুসলিমদের মুক্তি কোনদিনও সম্ভব হবে না। আবদুল লতিফ স্বদেশের স্বার্থে এই জনপদের বিভিন্ন সম্প্রদায়কে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করতেও সচেষ্ট থেকেছেন।

শিক্ষার্থীর কাজ	মুসলিম সমাজ সম্পর্কে নওয়াব আব্দুল লতিফের ধ্যান-ধারণা বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

উনিশ শতকের মুসলিম পুনর্জাগরণের আন্দোলনে যে কয়জন সংস্কারক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন নওয়াব আবদুল লতিফ তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ফরায়েজি বা ওহাবি আন্দোলনের ধাঁচে নয়; বরং সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে ইংরেজদের আনুকল্য লাভের মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসনাধীনে মুসলমানদের রক্ষা করার চেষ্টা করেন। তিনি দেখলেন যে, মুসলমানদের সবচেয়ে বড় দূর্বলতা শিক্ষা ক্ষেত্রে। ইংরেজি শিক্ষায় মুসলিমরা একেবারেই অনগ্রসর। তাই তিনি মুসলমানদের শিক্ষিত করতে ১৮৬৭ সালে মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি স্থাপন করেন। এ ছাড়া নীলকরদের হাত থেকে কৃষকদের রক্ষার তাগিদে একজন ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। বাংলার মুসলিম সমাজে একটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী হিসেবে গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে নওয়াব আবদুল লতিফের অবদান গুরুত্বপূর্ণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নওয়ার আবদুল লতিফ কাদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করেন?
(ক) সামরিক বাহিনী (খ) পুলিশ
(গ) নীলকর (ঘ) আমলা

২। নওয়াব আবদুল লতিফ ইংরেজদের সাথে মুসলিমদের কী ধরনের সম্পর্ক চাইতেন?
(ক) সহযোগিতামূলক (খ) বিচ্ছিন্নতাবাদী
(গ) ঘৃনামূলক (ঘ) কোনটিই নয়

৩। নওয়ার আবদুল লতিফ কোথায় বিদ্যালাভ করেন?
(ক) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (খ) কলকাতা মাদ্রাসা
(গ) প্রেসিডেন্সি কলেজ (ঘ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

পাঠ-৩.৪ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ (১৮৭০-১৯২৫)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের রাজনৈতিক আন্দোলন বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	রাজনৈতিক নিষ্ঠা, শাসনতান্ত্রিক সংস্কার, অসহযোগ আন্দোলন, বিশ্বশান্তি, স্বরাজ পার্টি, বেঙ্গল প্যাক্ট।

উপমহাদেশের রাজনীতিতে গভীর নিষ্ঠা ও দেশপ্রেমের জন্য চিত্তরঞ্জন দাশকে দেশবন্ধু আখ্যা দেওয়া হয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ছিলেন একজন বিলেত ফেরত ব্যারিস্টার। বিলেতে পড়ালেখা করার সময়ই তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা দাদাভাই নওরোজির সান্নিধ্যে আসেন। বলা যায়, তাঁর প্রত্যক্ষ রাজনীতির হাতেখড়ি হয়েছিল দাদাভাই নওরোজির সান্নিধ্যে এসে। রাজনৈতিক জীবনের গোড়া থেকে তিনি ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনকে মেনে নিতে পারেননি। চিত্তরঞ্জন দাশ ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর নির্মমতা ও অপশাসনের বিরোধিতা করেছেন তীব্রভাবে। রাজনীতিতে চিত্তরঞ্জন দাশ মহাত্মা গান্ধীর সাথে থাকলেও নানান বিষয়ে বিশেষ করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ সংক্রান্ত ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেন। তিনি মনে করতেন যে, আইন পরিষদে থেকেই সরকারের শাসনতান্ত্রিক সংস্কার, আইন, অধ্যাদেশ ইত্যাদির বিরোধিতা করতে হবে। অর্থাৎ শত্রুকে ঘায়েল করতে হলে তাদের মধ্যে থেকেই অন্যায়, নিপীড়নমূলক কাজের বিরোধিতা করতে হবে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জীবন বৃত্তান্ত

সি. আর দাশ নামেও পরিচিত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ১৮৭০ সালের ৫ নভেম্বর কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতায় জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর পৈতৃক নিবাস ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের অন্তর্গত তেলিরবাগ গ্রামে। তাঁর পিতা ভুবনমোহন দাস কলকাতা হাইকোর্টের সলিসিটার ও ব্রাহ্মসমাজের নেতা ছিলেন। ভবানীপুরের লন্ডন মিশনারী সোসাইটি স্কুল থেকে ১৮৮৬ সালে এন্ট্রান্স পাশ করার পর চিত্তরঞ্জন দাশ কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। এরপর উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য তিনি ইংল্যান্ডে গমন করেন এবং ১৮৯৪ সালে তিনি ব্যারিস্টারি পরীক্ষা পাশ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিক থেকে তিনি রাজনীতিতে জড়িত হন। অনুশীলন সমিতি ও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী কার্যক্রমে তিনি যুক্ত ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে মহাত্মা গান্ধীর ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি লাভজনক আইনজীবির পেশা পরিত্যাগ করে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে আরো বেশী সোচ্চার হয়ে ওঠেন। কিন্তু গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত করলে সি.আর দাশ সিদ্ধান্তটিকে গুরুতর ভুল বলে নিন্দা করেন। পরবর্তীতে তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করে স্বরাজ পার্টি গঠন করেন। ক্ষণজন্মা এই দেশবন্ধু ১৯২৫ সালের ১৬ জুন অসুস্থ অবস্থায় দার্জিলিংয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের রাজনৈতিক চিন্তা

চিত্তরঞ্জন দাশ স্বরাজ অর্জনের জন্য আন্দোলনকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পথ মনে করলেও, নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতির গুরুত্বও তিনি স্বীকার করেছেন। গান্ধীজীর ন্যায় তিনিও অহিংস পন্থায় স্বদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পক্ষপাতী ছিলেন। রাজনৈতিক জীবনে তিনি মনে করতেন যে ব্রিটিশ সরকার বিরোধী কর্মকান্ড পরিচালনার সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত স্থান হলো আইন পরিষদ। অর্থাৎ তিনি স্বদেশে ইংরেজ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন সমর্থন করতেন না ঠিকই কিন্তু মনে করতেন ইংরেজ প্রবর্তিত আইন সভার অভ্যন্তরে থেকেই ব্রিটিশ সরকার বিরোধী চাপ সৃষ্টি করতে হবে। নিম্নে চিত্তরঞ্জন দাশের আরো কিছু রাজনৈতিক চিন্তা তুলে ধরা হলো।

- জাতীয়তাবাদকে চিত্তরঞ্জন দাশ বিশ্ব শান্তির সোপান মনে করতেন। জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েই তিনি স্বরাজ আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন। তিনি মনে করতেন ভারতীয়দের উপর চাপিয়ে দেওয়া ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠান কোনদিনও এদেশের মানুষের ভাগ্যোন্নয়ন ঘটাতে পারবে না।
- চিত্তরঞ্জন দাশ সংসদীয় সরকারকে দায়িত্বশীল সরকার হিসেবে মনে করতেন। কারণ প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত সংসদই জনসাধারণের আশা-আকাঙ্খা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।
- চিত্তরঞ্জন দাশের সময়ে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে যে সমস্যাটি অত্যন্ত প্রকট ছিল তা হলো হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সমস্যা। তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেন যে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সমস্যা জিইয়ে রেখে স্বরাজ আন্দোলনের গন্তব্যে পৌঁছানো অনেক কঠিন হবে। আর তাই ১৯২৩ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের পূর্বে তিনি নিজ প্রদেশে মুসলমান সম্প্রদায়ের সাথে একটি চুক্তি করেন যা 'বেঙ্গল প্যাক্ট' নামে পরিচিত। 'বেঙ্গল প্যাক্ট' এ সরকারি চাকুরিতে মুসলমানদের জন্য শতকরা ৫৫ ভাগ আসন সংরক্ষণের কথা বলা হয়। যতদিন মুসলমানরা ৫৫ শতাংশে না পৌঁছায়, ততদিন পর্যন্ত মোট সরকারি চাকুরির ৮০ ভাগ মুসলমানদের জন্য সংরক্ষণের কথা বলা হয়।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ স্বদেশের কৃষ্টি ও ঐতিহ্যকে নিগূঢ়ভাবে ভালবেসেছেন। তিনি ছিলেন একজন বিশুদ্ধ বাঙালি। স্বরাজ পার্টি গঠন, বেঙ্গল প্যাক্ট এর মত উদ্যোগগুলি নিয়ে এ জনপদের রাজনীতিকে অসাম্প্রদায়িক ধারায় প্রবাহিত করতে সচেষ্ট হন চিত্তরঞ্জন দাশ।

শিক্ষার্থীর কাজ	চিত্তরঞ্জন দাশের রাজনৈতিক অবদান আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

রাজনৈতিক নিষ্ঠা ও গভীর দেশপ্রেমের জন্য এই উপমহাদেশের জনগণ চিত্তরঞ্জন দাশকে দেশবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করে। একজন বিলেত ফেরত ব্যারিস্টার হওয়া সত্ত্বেও ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ছিল তাঁর অনঢ় অবস্থান। তিনি রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকেই ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনকে মেনে নিতে পারেননি। অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে মহাত্মা গান্ধীর ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি লাভজনক আইনজীবির পেশা পরিত্যাগ করে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে আরও বেশি সোচ্চার হয়ে দেশপ্রেমের অমোঘ স্বাক্ষর রাখেন। 'বেঙ্গল প্যাক্ট' দেশবন্ধুর অসাম্প্রদায়িক চিত্তের অনন্য উদাহরণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বেঙ্গল প্যাক্টের রূপকার কে?
(ক) পন্ডিত মতিলাল নেহেরু (খ) মহাত্মা গান্ধী
(গ) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ (ঘ) মাওলানা শওকত আলী

২। দেশবন্ধু নামে খ্যাত কে?
(ক) ফজলুল হক (খ) চিত্তরঞ্জন দাশ
(গ) আব্দুল লতিফ (ঘ) সুভাস চন্দ্র বসু

৩। বেঙ্গল প্যাক্ট হল-
i. হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি বাড়ানোর চেষ্টা
iii. হিন্দু-মুসলিম ঐক্য বৃদ্ধি
iii. হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা বাড়ানো
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৩.৫ নবাব স্যার সলিমুল্লাহ (১৮৭১-১৯১৫)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- নবাব স্যার সলিমুল্লাহর জীবন বৃত্তান্ত জানতে পারবেন।
- নবাব স্যার সলিমুল্লাহর রাজনীতির ক্ষেত্রে অবদান ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিক্ষা-সংস্কৃতি ও মানব সেবায় তাঁর অবদান বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	বঙ্গভঙ্গ, মুসলিম লীগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মুসলিম সম্প্রদায়, ন্যায্য, শিক্ষা বিস্তার

ঢাকার বিখ্যাত নবাব পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও চিন্তা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে নবাব স্যার খাজা সলিমুল্লাহ ছিলেন অনেকের থেকে আলাদা। ছোটবেলা থেকেই মেধাবী নবাব সলিমুল্লাহ বাংলার পশ্চাৎপদ মুসলিম সমাজের দুঃখ-দুর্দশা নিয়ে ভেবেছেন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ হলে তিনি খুশি হয়েছিলেন এই ভেবে যে, এই বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে এ অঞ্চলের দূর্দশাগ্রস্ত মুসলমানদের সরকারি ও প্রশাসনিক সুবিধা পাওয়ার কিছুটা হলেও সুযোগ সৃষ্টি হবে। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হলে তিনি বঙ্গভঙ্গ রদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক বক্তব্য দিতে থাকেন এবং বলতে থাকেন যে বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার মুসলমানদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যে দ্বার খুলেছিল সেটাও বন্ধ করে দিয়েছে। ব্রিটিশ সরকারকে সহযোগিতার মাধ্যমে মুসলমানদের জন্য সুযোগ-সুবিধা আদায়ের পক্ষপাতি ছিলেন তিনি। নবাব সলিমুল্লাহ মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে বিভিন্ন স্বশাসিত স্থানীয় সংস্থা ও আইনসভায় প্রতিনিধি নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য দাবী তুলেছিলেন।

নবাব স্যার সলিমুল্লাহ এর জীবন বৃত্তান্ত

১৮৭১ সালের ৭ জুন ঢাকার বিখ্যাত নবাব পরিবারে খাজা সলিমুল্লাহ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম নবাব খাজা আহসানউল্লাহ। খাজা সলিমুল্লাহ নবাবী পরিবারের বিত্ত-বৈভবের মধ্যে বেড়ে উঠলেও চিন্তা-চেতনায় ছিলেন আলাদা। নবাব পরিবারের মধ্যে সলিমুল্লাহ ছিলেন সবচেয়ে আলোচিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। যৌবনকালে তিনি কিছুকাল ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে সরকারি চাকুরি করলেও পরে চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে সমাজকল্যাণমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯০১ সালে তাঁর পিতার মৃত্যু হলে জ্যেষ্ঠ পুত্র হিসেবে তিনি নবাবের পদসহ পারিবারিক কর্তৃত্ব লাভ করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি সৎ, সাহসী ও ধার্মিক ছিলেন। নবাব সলিমুল্লাহ ১৯১৫ সালের ১৬ জানুয়ারি কলকাতায় মারা যান।

নবাব স্যার সলিমুল্লাহর রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মকান্ড

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ হলে তিনি খুশি হয়েছিলেন এটা ভেবে যে বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে এ অঞ্চলের দুর্দশাগ্রস্ত মুসলমানদের উন্নয়নের দ্বার কিছুটা হলেও খুলবে। শুধু বঙ্গভঙ্গই নয়, এ জনপদের মুসলমানদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট যেকোন রাজনৈতিক ব্যাপারেই তিনি আগ্রহী ছিলেন।

বঙ্গভঙ্গ ও নবাব সলিমুল্লাহ

নবাব সলিমুল্লাহ ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের পরে ঢাকা নতুন প্রদেশের রাজধানী হলে দারুণ খুশি হয়েছিলেন। পরবর্তীতে কংগ্রেস বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করলে তিনি বঙ্গবিভাগ টিকিয়ে রাখার পক্ষে জনমত গড়ে তোলার জন্য ব্যাপক তৎপরতা চালান। কংগ্রেসের আন্দোলনের কাছে নতি স্বীকার করে ১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসে ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ রদ করলে নবাব স্যার সলিমুল্লাহ খুবই মর্মাহত হন।

মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা ও নবাব সলিমুল্লাহ

১৯০৬ সালে ডিসেম্বর ঢাকায় নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নবাব সলিমুল্লাহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। বঙ্গভঙ্গের পক্ষে বাংলার বাইরের মুসলমানদের সমর্থন আদায়ের আশায় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করার জন্য নবাব সলিমুল্লাহ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। অবশ্য সর্বভারতীয় পর্যায়ে ভারতের মুসলমানদের একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের তাগিদ ও চিন্তা-ভাবনা বঙ্গভঙ্গের আগেও চলছিল। সে যা হোক, নবাব সলিমুল্লাহ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিশিষ্ট মুসলিম নেতৃবৃন্দকে নতুন প্রদেশের রাজধানী ঢাকায় এক অধিবেশনে মিলিত করে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করেন।
মুসলিম স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখার জন্য নবাব সলিমুল্লাহ সকল প্রদেশের স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে, সংস্থায়, আইনসভায় মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন দাবি করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও নবাব সলিমুল্লাহ নানামুখী অবদান রাখেন। এছাড়াও মুসলিম সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক সামগ্রিক উন্নয়নে নবাব সলিমুল্লাহ আজীবন নানামুখী ভূমিকা রেখেছেন।

শিক্ষার্থীর কাজ	মুসলিম সম্প্রদায়ের কল্যাণে নবাব সলিমুল্লাহর অবদান আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

নবাব স্যার সলিমুল্লাহ সারাজীবন ধরেই বাংলার পশ্চাৎপদ মুসলিম সমাজের দুঃখ-দুর্দশা নিয়ে ভেবেছেন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ হলে তিনি খুশি হয়েছিলেন। সলিমুল্লাহ মনে করেছিলেন বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে এ অঞ্চলের দুর্দশাগ্রস্ত মুসলমানদের সরকারি ও প্রশাসনিক সুবিধা পাওয়ার কিছুটা হলেও সুযোগ সৃষ্টি হবে। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হলে তিনি এর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক বক্তব্য দিতে থাকেন। তিনি বলেন, বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার মুসলমানদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যে দ্বার খুলেছিল সেটাও বন্ধ করে দিল। নবাব সলিমুল্লাহ ১৯০৬ সালের ঢাকায় নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং এতে তিনি সফল হন। বস্তুত: নবাব সলিমুল্লাহ সারা জীবন মুসলিম সম্প্রদায়ের কল্যাণে নানামুখী ভূমিকা রেখেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নবাব সলিমুল্লার পিতার নাম কী?
(ক) নবাব খাজা আলীমুল্লাহ (খ) নবাব খাজা হাবিবুল্লাহ
(গ) নবাব খাজা আহসান উল্লাহ (ঘ) খাজা হাসান আশকারী

২। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় কে অবদান রেখেছিলেন?
(ক) নবাব সলিমুল্লাহ (খ) নবাব খাজা আলীমুল্লাহ
(গ) নবার সিরাজউদ্দৌলা (ঘ) নবাব আলীবর্দী খান

৩। মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য নবাব সলিমুল্লাহর সবচেয়ে বড় উদ্যোগ কোনটি?
(ক) মিটফোর্ড হাসপাতাল (খ) সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ
(গ) আহসান উল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল (ঘ) মোহামেডান প্রভিন্সিয়াল ইউনিয়ন

পাঠ-৩.৬ শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকের জীবন বৃত্তান্ত জানতে পারবেন।
- শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকের রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে অবগত হবেন।
- কৃষক-শ্রমিক প্রজাদের জন্য তাঁর বিভিন্ন অবদান বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	জনদরদী, কৃষক সমাজ, জমিদারি, পৃথকরাষ্ট্র, বঙ্গীয় আইন সভা, নিখিল বঙ্গ প্রজাসমিতি, লাহোর প্রস্তাব।

বাঙালি জাতিসত্তা বিকাশে যে সকল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আজীবন সংগ্রাম করেছেন শেরেবাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক তাদের একজন। তাঁকে একজন জনদরদী রাজনীতিবিদ হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। বাংলার কৃষক সম্প্রদায়ের দাবি-দাওয়া বাস্তবায়ন করার জন্য তিনি সবসময় তৎপর থাকতেন। এ জন্য তাঁকে অবহেলিত কৃষক সমাজের যোগ্য অভিভাবক হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। বাংলার সাধারণ মানুষ তথা কৃষকের জীবন মানোন্নয়ন করার জন্য তিনি শিক্ষার অগ্রগতিতে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছেন। কৃষকের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারটি মাথায় রেখেই এবং তাদেরকে অগ্রাধিকার দিতে গিয়েই এ কে ফজলুল হক ১৯৩৫ সালে তাঁর সৃষ্ট রাজনৈতিক দলের নতুন নামকরণ কৃষক প্রজা পার্টি করেন। মহাজন ও জমিদারদের অত্যাচার থেকে কৃষকদের মুক্তিদান ও জমিদারি ব্যবস্থা উচ্ছেদ করার জন্য ফজলুল হকের নেতৃত্বে কৃষক প্রজা পার্টি গণ-আন্দোলন পর্যন্ত করেছে। তিনি নানান সময়ে রাষ্ট্রীয় পদে আসীন থাকা অবস্থায় সর্বনাশা ঋণের হাত থেকে কৃষকদের রক্ষার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। শিক্ষামন্ত্রী থাকা অবস্থায় এ অঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের জন্য তিনি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাঁর সময়ে বঙ্গীয় আইনসভায় প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করে আইন পাশ করা হয়। বাংলার হতদরিদ্র প্রজাকূলের জন্য আজীবন লড়াই করেছেন শেরেবাংলা। লাহোর প্রস্তাবের উত্থাপক ছিলেন শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক। এই লাহোর প্রস্তাবের মাধ্যমেই প্রথম বাংলার মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য আলাদা রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখানো হয়।

শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকের জীবন বৃত্তান্ত

১৮৭৩ সালের ২৬ অক্টোবর শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক বৃহত্তর বরিশাল জেলার রাজাপুর থানাধীন সাতুরিয়া গ্রামে নিজ মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার বাড়ি বরিশালের চাখার। তাঁর পিতা কাজী ওয়াজেদ ছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী। ফজলুল হক বাল্যকাল থেকেই তীক্ষ্ণ মেধা শক্তির পরিচয় দেন। তৎকালে জমিদারের জুলুম ও ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর শোষণ তাঁর অন্তরে মর্মপীড়া সৃষ্টি করেছিল। ফজলুল হক সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দারুণভাবে অনুভব করতেন। তাঁর সারা জীবনের রাজনীতির অন্যতম লক্ষ্য ছিল সাধারণ মানুষের কল্যাণ সাধন। ফজলুল হকের কর্মময় জীবন ছিল অত্যন্ত বিচিত্র। তাঁর জীবদ্দশায় তিনি পত্রিকা সম্পাদনা, আইন ব্যবসা, অধ্যাপনা, সরকারি চাকরি এবং রাজনীতি সবই করেছেন। ১৯৬২ সালের ২৭ এপ্রিল তিনি মারা যান।

শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকের রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মকান্ড

পিছিয়ে পড়া মুসলমান সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এ কে ফজলুল হক কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থায় সকল সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। ব্রিটিশ শাসন এবং অবাঙালি নেতৃত্বের বিরোধিতা ছিল তাঁর চেতনামূলে। কৃষক-প্রজা সাধারণ মানুষ ছিল তাঁর রাজনৈতিক চিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের কাছে সমান জনপ্রিয় ছিলেন এ কে ফজলুল হক। নিম্নে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের কিছু রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মকান্ড তুলে ধরা হল-

- ১৯১৬ সালের হিন্দু-মুসলমান 'লক্ষ্ণৌ চুক্তি' সম্পাদনে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিলেন।
- ১৯১৮-১৯ সালে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

- ১৯২৯ সালে তিনি 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন, ১৯৩৬ সালে যার নতুন নামকরণ হয় কৃষক-প্রজা পার্টি।
- ১৯৩০-১৯৩২ সালে লন্ডনে ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের লক্ষে যে গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে তিনি অংশগ্রহণ করেন এবং জোরালো বক্তব্য রাখেন।
- ১৯৪২ সালে সামান্য কয়েক দিন বাদে, ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী আসীন ছিলেন।
- ১৯৪০ সালে লাহোরে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এ প্রস্তাবে একাধিক স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হয়েছিল। ১৯৪২ সাল থেকেই শেরেবাংলা সাম্প্রদায়িক "দ্বিজাতি তত্ত্বের" জোরালো বিরোধীতা শুরু করেন।

শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকই এ জনপদের রাজনীতিতে জমিদার-অভিজাত নেতৃত্বের চিরাচরিত বেষ্টনী ভেঙ্গে দেন। তিনি সাধারণ মানুষের জন্য 'ডাল-ভাত' কর্মসূচি প্রবর্তন করেন।

শিক্ষার্থীর কাজ	শেরেবাংলার রাজনৈতিক জীবন আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

একজন জনদরদী, সাহসী ও বলিষ্ঠ রাজনীতিবিদ হিসেবে বাংলার কৃষক, বাংলার মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন শেরেবাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক। বাংলার সাধারণ মানুষ তথা কৃষকের স্বার্থরক্ষার তাগিদে ফজলুল হক ১৯৩৫ সালে তাঁর সৃষ্ট রাজনৈতিক দলের নতুন নামকরণ করেন কৃষক প্রজা পার্টি । জোতদার-মহাজন ও জমিদারদের অত্যাচার থেকে কৃষকদের মুক্তিদান ও জমিদারি ব্যবস্থা উচ্ছেদ করার জন্য ফজলুল হকের নেতৃত্বে কৃষক প্রজা পার্টি গণ-আন্দোলনে লিপ্ত হয়েছিল। ভারতবর্ষের মুসলমানদের জন্য একাধিক আলাদা রাষ্ট্রের দাবি সম্বলিত "লাহোর প্রস্তাব" উত্থাপন করেছিলেন শেরেবাংলা। ১৯৪০ সালে এ প্রস্তাব উত্থাপন করলেও, ১৯৪২ সাল থেকেই তিনি সাম্প্রদায়িক "দ্বিজাতি তত্ত্বের" বিরোধীতা শুরু করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?

(ক) ১৮৫২ সালে (খ) ১৮৬৪ সালে

(গ) ১৮৭৩ সালে (ঘ) ১৮৮১ সালে

২। কৃষকদের স্বার্থ রক্ষায় এ কে ফজলুল হক-

i. ঋণ সালিসী বোর্ড স্থাপন করেন

ii. প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধন করেন

iii. ডাল-ভাত কর্মসূচি চালু করেন

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩। শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকের নাম জড়িয়ে আছে

(ক) কৃষক প্রজা পার্টি (খ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(গ) ভাষা আন্দোলন (ঘ) ছয় দফা

পাঠ-৩.৭ মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী (১৮৮০-১৯৭৬)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর জীবন-বৃত্তান্ত জানতে পারবেন।
- তাঁর সমকালীন সমাজ ও রাজনীতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর রাজনৈতিক কর্মকান্ড সম্পর্কে অবগত হবেন।

মুখ্য শব্দ	সাম্রাজ্যবাদ, মজলুম, কৃষক-শ্রমিক, অধিকার, অসহযোগ, মুক্তিযুদ্ধ।

সাধারণ মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য বাংলার যেসব সন্তান আমৃত্যু সংগ্রাম করে গেছেন তাঁদের অন্যতম মজলুম জননেতা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। মওলানা ভাসানী এমন এক রাজনৈতিক নেতা ছিলেন ক্ষমতার মস্‌নদ যাকে কোন দিন বশীভূত করতে পারেনি। মওলানা ভাসানীর জন্মই হয়েছিল যেন বাংলার খেটে খাওয়া কৃষক-শ্রমিকের অধিকার আদায়ের আন্দোলন-সংগ্রামে জীবনাতিপাত করার জন্য। তাঁর আপোষহীন রাজনীতির পিছনে ছিল এ জনপদের কৃষক-জনতার স্বার্থ। তাঁর রাজনৈতিক দর্শন ছিল অবহেলিত সাধারণ মানুষের কল্যাণ ও অর্থনৈতিক মুক্তি। ভাসানী এমন একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যিনি ব্রিটিশ ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ এ তিন রাষ্ট্রেরই রাজনৈতিক কর্মকান্ডে সংগ্রামী অবদান রেখেছেন। মুসলিম লীগের রাজনীতিতে ভূমিকা রাখা থেকে শুরু করে আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা, যুক্তফ্রন্ট গঠন ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠন ইত্যাদি রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অনবদ্য অবদান রেখে গেছেন তিনি। সর্বোপরি, জেনারেল আইয়ুব খান বিরোধী আন্দোলনে ভূমিকা রেখে এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সমর্থন দানের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনে অবিস্মরণীয় অবদান রাখেন।

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর জীবন বৃত্তান্ত

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ১৮৮০ সালের ১২ ডিসেম্বর তৎকালীন পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমা শহরের অদূরবর্তী ধনপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল হাজী শরাফত আলী খান। অতি অল্প বয়সে ভাসানী পিতা-মাতাকে হারান। পিতা-মাতার মৃত্যুর পর আরো দুই ভাইকে হারিয়ে বালক আব্দুল হামিদ ওরফে চেকা মিয়া তাঁর চাচা ইব্রাহিম খানের আশ্রয়ে থেকে স্থানীয় মাদ্রাসায় কিছুকাল পড়াশুনা করেন। তৎকালীন সমাজের সাধারণ মানুষের দুঃখ জর্জরিত জীবনের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল বলে তিনি উৎপীড়িত মানবতার ডাকে দরদী বন্ধুর মত সাড়া দিয়েছেন। টাঙ্গাইলের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। ব্রিটিশ বিরোধী অসহযোগ-খেলাফত আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভাসানীর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়। সারাজীবন তিনি নিপীড়িত মানুষের জন্য লড়াই সংগ্রাম করে গেছেন । ভাসানী ১৯৭৬ সালের ১৭ নভেম্বর মৃত্যুবরণ করেন। টাঙ্গাইলের সন্তোষে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মকান্ড

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে ক্ষমতার মোহ কখনো আচ্ছন্ন করতে পারেনি। তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মকান্ড আবর্তিত হয়েছে সাধারণ মানুষের মুক্তিকে ঘিরে। তিনি শোষণ ও বঞ্চনা থেকে বাংলার নিপীড়িত মানুষকে মুক্ত করার জন্য সারা জীবন সংগ্রাম করেছেন।

- মওলানা ভাসানী ১৯৩৭ সালে মুসলিম লীগে যোগদান করেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি আসাম মুসলিম লীগের সভাপতি হন।
- তৎকালীন পাকিস্তানের মুসলিম লীগের পূর্ব বাংলার ক্ষুব্ধ সদস্যরা ১৯৪৯ সালের ২৪ জুন ঢাকায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করে এবং এই নতুন রাজনৈতিক দলটির সভাপতি নির্বাচিত হন মওলানা ভাসানী।

- ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে ঢাকায় পুলিশের গুলিতে কয়েকজন ছাত্র নিহত হলে ভাসানী এক তীব্র প্রতিবাদী বিবৃতি দেন। পুলিশ তাঁকে গ্রামের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠায়।
- ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন উপলক্ষ্যে আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসেবে যুক্তফ্রন্ট নামে একটি বিরোধী দলীয় মোর্চা গঠন করেন। যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে ২২৮ টি আসন লাভ করে। এর মধ্যে আওয়ামী লীগের আসন ১৪৩টি পক্ষান্তরে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ মাত্র ৭ টি আসন পায়।
- ১৯৫৭ সালে মওলানা ভাসানী ঢাকায় পাকিস্তানের সকল বামপন্থী দলের একটি সম্মেলন আহবান করেন। এই সম্মেলনের মাধ্যমে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) নামক নতুন একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। তিনি এই দলের সভাপতি নির্বাচিত হন।
- ভাসানী আইয়ুব সরকারকে সাম্রাজ্যবাদের লেজুড় হিসেবে গণ্য করেন এবং এই স্বৈরশাসকের অপসারনের জন্য তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলেন। এই সময়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহার এবং মুক্তিদানের জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করেন।
- ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য যে উপদেষ্টা কমিটি বানানো হয় ভাসানী সেই কমিটির অন্যতম সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী সারা জীবন রাজনীতি করেছেন মেহনতী মানুষকে শোষক ও প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের হীন ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার করে তোলার জন্যে। জীবনভর মেহনতী মানুষের সঙ্গে থাকায় তাঁকে মজলুম জননেতা খেতাব দেওয়া হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	মওলানা ভাসানীর রাজনীতির দর্শন আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ছিলেন বাংলার খেটে খাওয়া মানুষের অধিকার আদায়ের এক সরব সৈনিক। ক্ষমতার মসনদ কখনও তাঁকে আকর্ষণ করে নি। সাধারণ মানুষের পাশে তিনি ছিলেন সদা ঢাল হয়ে, বন্ধু হয়ে। আর এ কারণে মাওলানা ভাসানীকে বলা হয়ে থাকে 'মজলুম জননেতা'। তিনি সারাজীবন রাজনীতি করেছেন মেহনতী মানুষকে শোষক ও প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের হীন ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার করে তোলার জন্যে। তাঁর রাজনৈতিক দর্শন ছিল অবহেলিত সাধারণ মানুষের কল্যাণ ও অর্থনৈতিক মুক্তি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। মওলানা ভাসানীর মুসলিম লীগে যোগদান করেন কত সালে?

(ক) ১৯১৫ সালে (খ) ১৯১৬ সালে

(গ) ১৯১৭ সালে (ঘ) ১৯৩৭ সালে

২। ১৯৪৯ সালে মওলানা ভাসানী কোন দলের সভাপতি হন?

(ক) মুসলিম লীগ (খ) জনতা পার্টি

(গ) ন্যাপ (ঘ) আওয়ামী মুসলিম লীগ

পাঠ-৩.৮ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (১৮৯২-১৯৬৩)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর রাজনৈতিক জীবনের পটভূমি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	প্রতিভাবান, গণতন্ত্রমনা, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, অসাম্প্রদায়িক, অখন্ড, বাংলা, সংবিধান।

ভারত বিভাগের প্রাক্কালে বাংলা প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ভারত ও পাকিস্তানের পাশাপাশি অখন্ড স্বাধীন বাংলা নামে আর একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ১৯৪৯ সালে পাকিস্তানের বিরোধী দল আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। পরবর্তীতে এ দলটিই আওয়ামী লীগ নাম ধারণ করে এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দেয়। শুধু তাই নয় এমনকি ব্রিটিশ-ভারতেও তিনি একজন তুখোড় প্রতিভাবান রাজনৈতিক সংগঠক হিসেবে পরিচিতি পেয়েছিলেন। একজন শ্রমিক নেতা হিসেবে কলকাতায় রাজনৈতিক কর্মজীবন শুরু করলেও, অল্প সময়ে তিনি মেহনতি মানুষের জন্য প্রায় ৩৬টি ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তোলেন। তিনি ১৯২১ সালে বঙ্গীয় আইন পরিষদের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন এবং আইনসভায় জনগণের অধিকারের প্রশ্নে অনেক জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন। সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বের কারণেই ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগ জনপ্রিয়তার শীর্ষে অবস্থান করে। গণতান্ত্রিক রাজনীতি ও রীতিনীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে তিনি আমৃত্যু গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছেন। বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর রাজনৈতিক দীক্ষা পেয়েছিলেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কাছ থেকে।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর জীবন বৃত্তান্ত

১৮৯২ সালের ৮ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুরে সম্ভ্রান্ত এক পরিবারে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা জাহিদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি। সোহরাওয়ার্দীর শিক্ষাজীবন ছিল পারিবারিক ঐতিহ্যের ধারায় পূর্ণ ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। তিনি বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও আইনশাস্ত্র ইত্যাদিতে অগাধ পান্ডিত্য অর্জন করেন। ১৯১৮ সালে তিনি বিলেত থেকে বার-এট-ল পরীক্ষা পাশ করে স্বদেশে ফিরে আসেন। দেশে ফিরে তিনি স্বল্প সময়ের মধ্যেই কলিকাতার একজন নামকরা আইনজীবি এবং বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পান। এরপর থেকে শুরু করে তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় আইন ব্যবসা ও রাজনীতি করে কাটিয়েছেন।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মকান্ড

১৯২১ সনে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হবার পর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের অসাম্প্রদায়িক মানসিকতা, উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও গভীর দেশপ্রেম দ্বারা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী দারুণভাবে অনুপ্রাণিত হন। অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা ও বাগ্মিতার বলে তিনি একজন উঁচুদরের রাজনীতিবিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ওঠেন। অবহেলিত ও অসংগঠিত মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ ও অধিকার আদায়ের জন্য সোহরাওয়াদী সর্বদা সচেষ্ট থেকেছেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সারা জীবন ধরে চেয়েছিলেন যে এ জনপদে পাশ্চাত্য ধাঁচের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠুক; যার মাধ্যমে মানুষের মুক্তি ঘটবে। নিম্নে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর আরো রাজনৈতিক চিন্তা ও রাজনৈতিক কর্মকান্ড তুলে ধরা হল-

- ১৯২১ সালে শহীদ সোহরাওয়ার্দী বঙ্গীয় আইন পরিষদে সর্বকনিষ্ঠ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন।
- তিনি ব্রিটিশ শাসন অবসানের লক্ষ্যে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯২৩ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এর নেতৃত্বে 'বেঙ্গল প্যাক্ট' চুক্তি সম্পাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

- ১৯৩৭ সালে তিনি মুসলিম লীগে যোগ দেন।
- শহীদ সোহরাওয়ার্দী ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন অবসানের প্রাক্কালে ভারত ও পাকিস্তানের পাশাপাশি একটি অখন্ড স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন।
- ১৯৪৯ সালের আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।
- পাকিস্তানে ১৯৫৬ সালে যে সংবিধান প্রণয়ন হয় তার পিছনেও শহীদ সোহরাওয়ার্দীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।
- তিনি মূলত একজন বাস্তববাদী রাজনীতিবিদ ছিলেন। ভারত বিভাগের পূর্বে তিনি মুসলমানদের পশ্চাৎপদতার জন্য পৃথক নির্বাচনের সমর্থন দিতেন। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির পর তিনি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে যৌথ নির্বাচনের সমর্থন দিতেন।
- ১৯৫৬-১৯৫৭ সালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন।
- সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনসহ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক পদে আসীন থেকেছেন।

এছাড়াও পুরোধা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সারাজীবন একজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সংগঠক হিসেবে বিভিন্ন সংগঠন সৃষ্টি করেছেন এবং নেতৃত্ব দিয়েছেন।

শিক্ষার্থীর কাজ	হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর রাজনৈতিক জীবন আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

গণতান্ত্রিক রাজনীতি ও রীতিনীতির প্রতি হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদী ছিলেন অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। তিনি আমৃত্যু গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছেন। অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা ও বাগ্মিতার বলে তিনি একজন প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ওঠেন। অবহেলিত ও অসংগঠিত মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ ও অধিকার আদায়ের জন্য তিনি সর্বদা সচেষ্ট থেকেছেন। আওয়ামী মুসলিম লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতাও তিনি। পরবর্তীতে এ দলটিই আওয়ামী লীগ নাম ধারণ করে এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দেয়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর যে রাজনৈতিক দীক্ষা তা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কাছ থেকে তিনি পেয়েছিলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সোহরাওয়াদী কোন দলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা?

(ক) কংগ্রেস (খ) মুসলিম লীগ

(গ) আওয়ামী লীগ (ঘ) কৃষক-প্রজা পার্টি

২। সোহরাওয়ার্দী কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

(ক) মেদিনীপুর খ) বর্ধমান

(গ) কলকাতা ঘ) ঢাকা

পাঠ-৩.৯ মাস্টারদা সূর্যসেন (১৮৯৪-১৯৩৪)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- মাস্টারদা সূর্যসেনের এর জীবন-আদর্শ ও সংগ্রামের পটভূমি বলতে পারবেন।
- মাস্টারদা সূর্যসেনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	নিপীড়ণ, সশস্ত্র প্রতিরোধ, বিপ্লবী, অস্ত্রাগার লুণ্ঠন

ব্রিটিশ শাসনের হাত থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করার জন্য যারা জীবন দিয়েছেন তাদের মধ্যে মাস্টারদা সূর্যসেনের নাম অগ্রগণ্য। সূর্যসেন পেশায় ছিলেন একজন শিক্ষক। তাই তাঁকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য বলা হত মাস্টারদা সূর্যসেন। ছাত্রজীবন থেকেই ভারতবর্ষের গরীব-দুঃখী মানুষের দুঃখ-কষ্ট তাঁকে ব্যাথিত করে তোলে। রাজনৈতিক দল কংগ্রেসের চট্রগ্রাম অঞ্চলের নেতা হিসেবে তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকান্ডে তৎপর হয়ে ওঠেন। কিন্তু তাতে তাঁর চিত্ত শান্ত হয় নি। ভারতবর্ষের শোষিত মানুষের উপর ব্রিটিশ সরকারের নিপীড়ন দ্রুত বন্ধের জন্য তিনি সশস্ত্র সংগ্রামের রাজনীতি বেছে নেন। সূর্যসেন মনে করতেন বিপ্লব ছাড়া ব্রিটিশদের ভারতবর্ষ থেকে সরানোর স্বপ্ন সুদূর পরাহত। সূর্যসেন তাঁর নেতৃত্বের গুণে অনেক তরুণ-তরুণীদের সংগঠিত করতে পেরেছিলেন এবং সশস্ত্র সংগ্রামী বাহিনীর সদস্য করতে পেরেছিলেন। এই সশস্ত্র সংগ্রামীদের সাথে নিয়েই ১৯৩০ সালের এপ্রিল মাস থেকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার লক্ষ্যে মাস্টারদা ব্রিটিশদের উপর আক্রমণ চালাতে শুরু করেন। ১৯৩৩ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি তিনি গ্রেফতার হন। ১৯৩৪ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি সূর্যসেনকে ফাঁসি দেয়া হয়।

মাস্টারদা সূর্যসেনের জীবন বৃত্তান্ত

মাস্টারদা সূর্যসেন ১৮৯৪ সালে চট্টগ্রামের রাউজান থানার নোয়াপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পুরো নাম সূর্যকুমার সেন। বাবা রাজমনি সেন এবং মা শশীবালা দেবী। সূর্যসেনের বাবা পেশায় ছিলেন একজন শিক্ষক। সূর্যসেন স্থানীয় দয়াময়ী বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষার পর নোয়াপাড়া উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। ১৯১২ সালে চট্টগ্রাম ন্যাশনাল হাইস্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চট্টগ্রাম কলেজে ভর্তি হন।

সূর্যসেন যখন নোয়াপাড়া উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের ছাত্র তখন বঙ্গভঙ্গকে (১৯০৫) কেন্দ্র করে বাংলায় স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয়। ক্রমে এই আন্দোলন বিশেষ করে চট্রগ্রাম এলাকায় বিপ্লবী আন্দোলনে রূপ নেয়। ১৯১৬ সালে মুর্শিদাবাদের বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে বি.এ. শ্রেণিতে পড়াকালীন শিক্ষক শতীশচন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক বৈপ্লবিক আদর্শে দীক্ষিত হন সূর্যসেন। সূর্যসেন চট্টগ্রামে ফিরে গিয়ে ব্রিটিশ বিরোধী একটি বিপ্লবী দল গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেন।

মাস্টারদা সূর্যসেনের রাজনৈতিক চিন্তা ও রাজনৈতিক কর্মকান্ড

সূর্যসেনের শিক্ষক অধ্যাপক শতীশচন্দ্র চক্রবর্তী যুগান্তর নামক বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বাংলাদেশে বিপ্লবীরা তখন অনুশীলন ও যুগান্তর এই দুই দলে বিভক্ত ছিলেন। ১৯১৮ সালে বহরমপুর থেকে ফিরে এসে সূর্যসেন 'যুগান্তর' দলে যোগ দিয়ে সংগঠনটিকে সক্রিয় করে তোলেন এবং বিবাদমান দল দুইটিকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেন। ক্রমে তাঁর দলই চট্টগ্রামে সক্রিয় হয়ে ওঠে। ১৯১৯ সালের পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে চট্টগ্রামের ছাত্ররা ক্লাস বর্জনসহ সভা-সমাবেশ করে। সভায় সূর্যসেন তাঁর বক্তৃতায় ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হন। এক পর্যায়ে অসহযোগ আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে তিনি স্কুলের শিক্ষকতা ত্যাগ করেন এবং দেওয়ানবাজার এলাকায় 'সাম্যশ্রম' নামে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। 'সাম্যশ্রম' থেকেই কংগ্রেসের কাজ ও গোপনে বিপ্লবীদের কর্মকান্ড পরিচালনা করতে থাকেন সূর্যসেন। গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন দ্বারা স্বরাজ অর্জন ব্যর্থ হলেও পুনরায় সংঘবদ্ধ হয়ে ব্রিটিশ রাজত্বের অবসানে

সংকল্পবদ্ধ হয়। চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের সংগঠিত করেন মাস্টারদা। এক পর্যায়ে সূর্যসেন গ্রেফতার হন এবং ১৯২৮ সালের শেষ দিকে মুক্তি পেয়ে পুনরায় বিপ্লবীদের সংগঠিত করার কাজ শুরু করেন। চট্টগ্রামে তিনি `ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি, এর একটি শাখা গড়ে তোলেন।

১৯২৯ সালে চট্টগ্রামের জেলা কংগ্রেসের সম্মেলনে সূর্যসেন সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন। এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সুভাষ চন্দ্র বসু। এ সময়ে বিভিন্ন বিক্ষোভ মিছিল ও বিপ্লবী কার্যক্রমের পরিকল্পনাও নির্দেশনা দিতে থাকেন। ১৯৩০ সালের ২২ এপ্রিলের সশস্ত্র বিদ্রোহ এবং অস্ত্রাগার লুটের ঘটনা ছিল সূর্যসেনের নেতৃত্বে বিপ্লবীদের দীর্ঘদিনের পরিকল্পনার ফসল। ১৯৩২ সালের জুন মাসে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ও কল্পনা দত্তকে চট্টগ্রাম কারাগার ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেবার নির্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু সে পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। পরে ২৪ সেপ্টেম্বর তারিখে প্রীতিলতা পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাবে সফল আক্রমণ চালান। এ সময় প্রীতিলতা গুলিবিদ্ধ হন এবং সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেন। এ ঘটনার পর মাস্টারদা পটিয়া এলাকার গৈরালা গ্রামে আত্মগোপন করেন। একজন গ্রামবাসীর বিশ্বাসঘাতকতায় ১৯৩৩ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি মাস্টারদা গ্রেফতার হন। পরের বছর ১২ ফেব্রুয়ারি তাঁর ফাঁসি হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	মাস্টার দা সূর্যসেন এর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

ব্রিটিশ অপশাসনের বিরুদ্ধে অকুতোভয় এক সৈনিক মাস্টারদা সূর্যসেন। ভারতবর্ষের শোষিত মানুষের ওপর ব্রিটিশ সরকারের নিপীড়ন দ্রুত বন্ধের জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের রাজনীতি বেছে নেন এই অকুতোভয় সৈনিক। সূর্যসেন মনে করতেন বিপ্লব ছাড়া ব্রিটিশদেরকে ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত করার আর কোন পথ নেই। গণমানুষের স্বার্থ রক্ষার্থে সূর্যসেন ব্রিটিশদের কাছে দেশদ্রোহী হিসেবে পরিগণিত হয়। এ অভিযোগে তাঁকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদন্ড প্রদান করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। মাস্টারদা কোন গ্রামে আত্মগোপন করেন?

(ক) চাখার (খ) নোয়াপাড়া

(গ) হায়দারপুর (ঘ) গৈরালা

২। মাস্টাদা সূর্যসেনকে বৈপ্লবিক আর্দশে উদ্বুদ্ধ করেন কে?

(ক) মহাত্মা গান্ধী (খ) সতীশ চন্দ্র চক্রবর্তী

(গ) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ (ঘ) সুভাষচন্দ্র বসু

পাঠ-৩.১০ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু (১৮৯৭-১৯৪৫)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর সমকালীন ভারতীয় রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট জানতে পারবেন।
- নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জীবন-বৃত্তান্ত জানতে পারবেন।
- ভারতীয়-স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অবদান মূল্যায়ন করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	কংগ্রেস, স্বাধীনতা, আজাদ হিন্দ ফৌজ, সশস্ত্রপন্থা, বিপ্লবী

ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশদেরকে বিতাড়িত করার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামপন্থী রাজনীতিকদের মধ্যে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু অন্যতম। রাজনৈতিকভাবে নেতাজির পরিবার ছিল খুবই সচেতন। পারিবারিক কারণে অথবা তৎকালীন ভারতের উত্তপ্ত রাজনৈতিক আবহাওয়ার কারণে সুভাষ বসু ছোটবেলা থেকেই বিদ্রোহী ভাবাপন্ন হয়ে বড় হতে থাকে। কলেজ জীবন থেকেই তিনি ইংরেজ শাসিত ভারতের বিপন্নদশা দেখে মর্মযাতনায় ভূগতে থাকেন। বিশেষ করে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ডের পরে তিনি শোকে ম্যূহমান হয়ে যান এবং ভাবতে থাকেন যে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ছাড়া আর কোনভাবেই ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব না। মাত্র ২৫ বছর বয়সেই সুভাষ বসু ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের পদ্ধতির প্রশ্নে, কঠোর আন্দোলনের পক্ষে থেকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অবিসংবাদিত নেতা মহাত্মা গান্ধীর সাথে দ্বিমত পোষণ করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত উভয়ের রাজনৈতিক চিন্তাধারা দুটি স্বতন্ত্র ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে। সুভাষ বসু ভারতের স্বাধীনতার জন্য কংগ্রেসের অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধিতা করেন এবং স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে সামরিক বাহিনীর ন্যায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বেঙ্গল ভলান্টিয়ার কোর গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। তিনি খুব শক্তভাবে বিশ্বাস করতেন যে, ভারতবাসীর মধ্যে অফুরন্ত চিত্তশক্তি আছে; আর এ কারণেই ভারত এক দিন স্বাধীন হবে।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জীবন বৃত্তান্ত

১৮৯৭ সনের ২৩ জানুয়ারি ভারত উপমহাদেশের অন্যতম বীর সন্তান স্বাধীনতাকামী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু উড়িষ্যার কটক শহরে জন্মগ্রহণ করেন। নেতাজির বাবার নাম জানকীনাথ বসু। তাঁর পিতা পেশায় ছিলেন একজন বিশিষ্ট আইনজীবী ও বঙ্গীয় বিধানসভার সদস্য। রাজনৈতিকভাবে নেতাজীর পরিবার ছিল খুবই সচেতন। পারিবারিক প্রভাবের কারণে হোক বা তৎকালীন ভারতে বিরাজমান উত্তপ্ত রাজনীতিক আবহাওয়ার কারণেই হোক, সুভাষ বসু কৈশোর থেকেই বিদ্রোহী ভাবাপন্ন ছিলেন। তিনি ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান লাভ করার পরও দেশসেবার ও স্বদেশের মুক্তির আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সরকারি চাকুরি গ্রহণ করেননি। সুভাষ চন্দ্র বসু ১৯৪৫ সনের ১৮ আগস্ট রহস্যজনক বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হন বলে সরকারিভাবে জানানো হয়।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর রাজনৈতিক চিন্তা

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর রাজনৈতিক চিন্তা ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডের পুরোটা জুড়ে ছিল ভারতবাসীর মুক্তি। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মাধ্যমে ভারত একদিন স্বাধীন হবে। সামাজিক বৈষম্য, সাম্প্রদায়িকতা, পরধর্ম-অসহিষ্ণুতার অবসান হবে। নিম্নে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর কয়েকটি পদক্ষেপ তুলে ধরা হল-

- ১৯৩৮ সালে মহাত্মা গান্ধীর বিরোধীতার মধ্যেই সুভাষ বসু কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন, গান্ধীর সাথে মতদ্বৈততার কারণে কংগ্রেস ত্যাগ করে অল ইন্ডিয়া ফরোয়ার্ড ব্লক নামে দল গঠন করেন।

- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ১৯৪১ সালে সুভাষচন্দ্র বসু গোপনে ভারত ছেড়ে রাশিয়া চলে যান। রাশিয়া থেকে তিনি বার্লিন যান। সেখানে তিনি ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামের লক্ষ্যে জার্মানির সমর্থন লাভ করেন। সুভাষ বসু ভারতের জন্য একটি অস্থায়ী সরকার গঠন করেন।
- ১৯৪৩ সালে তিনি 'আজাদ হিন্দ ' ফৌজের দায়িত্ব নেন এবং আজাদ হিন্দ সরকার গঠন করেন।
- ১৯৪৪ এর মার্চ মাসে তাঁর বাহিনী বার্মা পৌঁছে যায়।
- সুভাষ বসুর লক্ষ্য ছিল সামারিক অভিযানের মাধ্যমে ভারত থেকে ব্রিটিশদের বিতাড়িত করা।

শিক্ষার্থীর কাজ	নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর রাজনৈতিক চিন্তা আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশদের বিতাড়নে যে কয়জন রাজনীতিক উদ্যোগী হয়েছিলেন নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর তাঁদের অন্যতম। পারিবারিকভাবে রাজনৈতিক সচেতনতা এবং তৎকালীন ভারতের উত্তপ্ত রাজনৈতিক আবহাওয়ার কারণে সুভাষ বসু ছোটবেলা থেকেই বিদ্রোহী ভাবাপন্ন হয়ে বড় হতে থাকেন। তিনি ভারতের স্বাধীনতার জন্য কংগ্রেসের অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধিতা করেন। এক পর্যায়ে সুভাষ বসু দেশের বাইওে চলে যান এবং ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১০

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন

১। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

(ক) লক্ষ্ণৌ (খ) কটক

(গ) গুজরাট (ঘ) সুরাট

২। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর বাহিনীর নাম কি ছিল?

(ক) মুক্তি ফৌজ (খ) আজাদ হিন্দ ফৌজ

(গ) রেড আর্মি (ঘ) গণবাহিনী

পাঠ-৩.১১ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন বৃত্তান্ত জানতে পারবেন।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক কর্মকান্ড সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জাতির জনক হয়ে উঠা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	টুঙ্গিপাড়া, পাকিস্তান, আওয়ামী লীগ, ছয় দফা, মুক্তিযুদ্ধ, জাতির জনক, নির্মম হত্যাকান্ড, বিপদগামী সেনা

পাকিস্তানী অভ্যন্তরীণ উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে বাঙালির দুই যুগ দীর্ঘ সংগ্রামের সর্বাগ্রে গণ্য নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাঙালির জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের চূড়ান্ত অধ্যায় ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ এবং এ যুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার অনন্য কৃতিত্বের অধিকারী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। যুগের পর যুগ বাঙালির লড়াই সংগ্রাম পরিণতি পায় বঙ্গবন্ধুর কালজয়ী নেতৃত্বের মাধ্যমে। তিনি স্কুল ছাত্র থাকা অবস্থায় জনহিতকর ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়েন। তরুন বয়সেই বঙ্গবন্ধু ভারতীয় উপমহাদেশের তুখোড় রাজনৈতিক নেতা হোসেন সোহরাওয়ার্দীর সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর যোগ্য রাজনৈতিক শিক্ষানবিশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকেন।

ভারত ভাগ হবার পর শেখ মুজিব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন। চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের ন্যায্য অধিকারের দাবিতে আন্দোলন করায় তাঁকে ১৯৪৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়। ১৯৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ গঠনে অন্যতম প্রধান সংগঠক ছিলেন শেখ মুজিব। ১৯৪৯ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্যোক্তা, ভাষা আন্দোলন, যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের বিরোধী তথা বাঙালির স্বাধিকারের লড়াইয়ে শেখ মুজিব অগ্রসৈনিক। ১৯৬৬ সালের ছয় দফা বঙ্গবন্ধুকে অবিসংবাদিত নেতায় পরিণত করে। ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের নির্বাচন শেষ বিচারে বঙ্গবন্ধু অমোঘ নেতৃত্বের পরিচয় বহন করেন। নির্বাচনে জয় লাভ করা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ তথা বাঙালিকে ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করার ঘৃন্য ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের শুরুতেই অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন বঙ্গবন্ধু। এই অসহযোগ ছিল মূলত পাকিস্তানের মৃত্যু পরোয়ানা। ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণে বাংলাদেশের স্বাধীনতার যাবতীয় সঙ্কেত প্রদান করেন বঙ্গবন্ধু। অত:পর ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠ থেকে নি:সৃত হয় স্বাধীনতার ঘোষণা।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন বৃত্তান্ত

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে ১৯২০ সনের ১৭ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শেখ লুৎফর রহমান গোপালগঞ্জ দেওয়ানি আদালতের সেরেস্তাদার ছিলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল পথ চলতে বাধা-বিপত্তিতে পড়লে তিনি কখনো তা এড়িয়ে চলেননি; বরং সাহসিকতার সঙ্গে তার মোকাবেলা করেছেন। ১৯৪৭ সালে কলিকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে বি.এ. পাস করার পর একই বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিষয়ে ভর্তি হন। শেখ মুজিব ছিলেন আজীবন রাজনীতিক। রাজনৈতিক জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি শেরেবাংলা এ কে. ফজলুল হক, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মত পুরোধা রাজনীতিবিদদের সান্নিধ্যে আসেন এবং তাদের কাছ থেকে রাজনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনার অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। এ ছাড়া নেতাজী সুভাষ বসুর স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রয়াস বঙ্গবন্ধুকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বাংলাদেশের স্থপতি বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজ বাসভবনে দৃশ্যত সেনাবাহিনীর কতিপয় উচ্চাভিলাষী বিশ্বাসঘাতকের হাতে নির্মমভাবে সপরিবারে নিহত হন।

বিদেশে অবস্থান করছিলেন বিধায় বেঁচে যান বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ সন্তান বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর বোন শেখ রেহানা। বঙ্গবন্ধু হত্যার দৃশ্যপটে বিপদগামী সেনাসদস্যরা থাকলেও, এ কথা আজ প্রতিষ্ঠিত যে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকান্ড ছিল সর্বোতোভাবে একটি দেশি-বিদেশী চক্রান্তের ফল।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মকান্ড

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক চিন্তা বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখা যায়, তিনি মনে প্রাণে ছিলেন একজন উদারনৈতিক মুক্তিকামী মানুষ। তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা ও রাজনৈতিক কর্মকান্ড পুরোটা জুড়ে ছিল বাংলার গণমানুষের মুক্তি। নিম্নে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আরও কিছু রাজনৈতিক চিন্তা তুলে ধরা হল-

- পাকিস্তান সৃষ্টির আন্দোলনের সাথে যুক্ত থাকলেও, সাম্প্রদায়িক 'দ্বিজাতি তত্ত্বে' বঙ্গবন্ধুর অবিশ্বাস ছিল। তাই পাকিস্তানের জন্মের অল্প সময় পর থেকেই তিনি অসাম্প্রদায়িক উদার গণতান্ত্রিক রাজনীতির পথে হাঁটতে শুরু করেন।
- পাকিস্তানের একেবারে সূচনা পর্বেই বঙ্গবন্ধু বুঝতে পারেন যে পশ্চিম পাকিস্তানীরা বাঙালিদের ন্যায্য হিস্যা কখনোই বুঝিয়ে দেবে না।
- দল ও দলের বাইরে বিরোধীতা স্বত্ত্বেও ১৯৬৬ সালে ছয় দফা উত্থাপনের দূরদর্শিতা দেখান বঙ্গবন্ধু। ছয় দফা পরবর্তীতে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ হিসেবে চিহ্নিত হয়।
- ১৯৭০ সালের নির্বাচন থেকে শুরু করে ২৬ মার্চের স্বাধীনতা ঘোষণা পর্যন্ত প্রত্যেকটি ধাপে সর্বোচ্চ মাত্রার রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় দেন বঙ্গবন্ধু। তিনি কখনোই বাঙালির স্বাধীনতার সংগ্রামকে তথাকথিত বিচ্ছিনতাবাদের তকমার মধ্যে আটক হতে দিতে চাননি। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে, ১৯৭১ সালের ৫ই এপ্রিল প্রকাশিত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ম্যাগাজিন নিউজউইক এর প্রচ্ছদ প্রতিবেদনে বঙ্গবন্ধুকে 'পোয়েট অব পলিটিক্স' অর্থাৎ 'রাজনীতির কবি' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

স্বাধীনতার পরে জাতি গঠন ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য একের পর এক আদর্শিক ও বাস্তবানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন বঙ্গবন্ধু। দেশের ভেতরে নানামুখী শক্তির অরাজকতা ও বিদেশী চক্রান্তের পরিণতিতে একের পর এক বাধাগ্রস্ত হলেও, আমৃত্যু বাংলার মানুষের মুক্তির লড়াই চালিয়ে গেছেন বঙ্গবন্ধু।

শিক্ষার্থীর কাজ	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জাতির জনক হয়ে উঠার ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

বাঙালির স্বাধীনতার স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের তিনিই নেতা। এর আগে পাকিস্তানী শাসনের চব্বিশ বছরে বাঙালির সংগ্রামের সবচেয়ে উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব বঙ্গবন্ধু। তাঁর শেখ মুজিব থেকে শেখ সাহেব; শেখ সাহেব থেকে বঙ্গবন্ধু; বঙ্গবন্ধু থেকে জাতির পিতা হয়ে ওঠা মূলত: বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান বয়ান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি কে?

(ক) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (খ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

(গ) শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক (ঘ) মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

২। ছয় দফা কে উত্থাপন করেন?

(ক) শেরেবাংলা (খ) মওলানা ভাসানী

(গ) শহীদ সোহরাওয়ার্দী (ঘ) বঙ্গবন্ধু

৩। ১৯৭১ সালের কোন মাসে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়?

(ক) জানুয়ারি (খ) ফেব্রুয়ারি

(গ) মার্চ (ঘ) এপ্রিল

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

(ক) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১ নং ও ২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

আলীপুর গ্রামের মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা ধরনের লোকাচার লক্ষ্য করা যায়। আবদুল মালেক এসব লোকাচার অনুশীলনের বিরোধীতা করেন।

১। আবদুল মালেকের সাথে আপনার পাঠ্য বইয়ের কোন ব্যক্তির সাথে মিল খুঁজে পান?

(ক) নবাব আবদুল লতিফ (খ) শহীদ তিতুমীর

(গ) হাজী শরীয়তুল্লাহ (ঘ) স্যার সলিমুল্লাহ

২। উদ্দীপক বর্ণিত ব্যক্তির আন্দোলনের ধরণ ছিল-

i. সামাজিক

ii. ধর্মীয়

iii. রাজনৈতিক

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ দেশে ফিরে আসেন-

i. ১৮৯৪ সালে

ii. বার-এট-ল ডিগ্রি লাভ করে

iii. ইটালি থেকে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii

(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪ নং ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন

শামসুল আলম একজন খ্যাতনামা আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ। তিনি কৃষক দরদি ও শিক্ষানুরাগী। কৃষকের কল্যাণার্থে তিনি নানামুখী রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের পক্ষপাতী।

৪। উদ্দীপকে বর্ণিত শামসুল আলমের সাথে আপনার পাঠ্য বইয়ের কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের মিল পাওয়া যায়?

(ক) নবাব আবদুল লতিফ (খ) শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক

(গ) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ (ঘ) মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

৫। পাঠ্য বইয়ের ব্যক্তিত্বের কর্মকান্ডের ফলে তদানীন্তন ভারতবর্ষের কৃষকেরা-

i. জমিদারের কবল থেকে রক্ষা পায়

ii. বন্ধকি জমি ফিরে পায়

iii. রাজনৈতিক অধিকার লাভ করে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) i ও ii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৬। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে যেসব নির্দেশনা ছিল সেগুলো হলো-

i. স্বন্ধি স্থাপনের আহবান

ii. স্বাধীনতার সঙ্কেত

iii. শত্রু মোকাবেলার উপায়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

(খ) সৃজনশীল রচনামূলক অংশ

১। দেলোয়ার হোসেন হজব্রত পালন শেষে ঊনিশ শতকের গোড়ার দিকে দেশে ফিরে এসে সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। তিনি কৃষকদেরকে ব্রিটিশ শাসক, জমিদার ও মহাজনদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সচেতন করে তোলেন। সরকার তাকে দেশদ্রোহী হিসেবে ঘোষণা দেয় এবং তাঁকে প্রতিহত করার উদ্যোগ নেয়। তিনি স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন।

(ক) আজাদ হিন্দ ফৌজ কি?

(খ) ফরায়েজি আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?

(গ) মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীকে মজলুম জননেতা বলা হয় কেন?

(ঘ) দেলোয়ার হোসেনের কার্যক্রমের সাথে উপমহাদেশের কোন ব্যক্তিত্বের কর্মকান্ডের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করুন।

২। ছকটি লক্ষ্য করুন

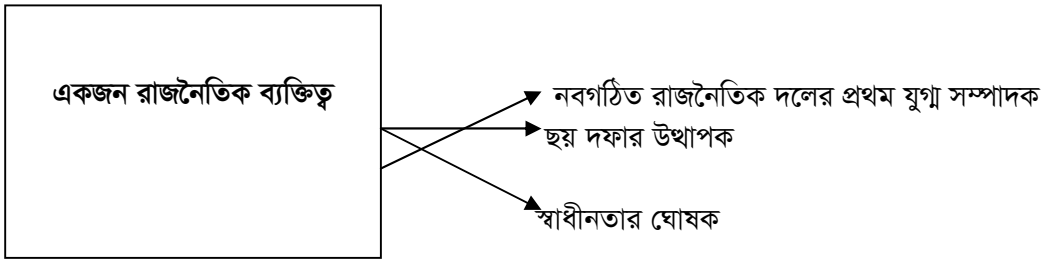

ক. তিতুমীরের প্রকৃত নাম কি?

খ. লাহোর প্রস্তাবের মূল কথা কি ছিল?

গ. উদ্দীপকে কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে উক্ত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের অবদান মূল্যায়ন করুন।

উত্তরমালা :

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১ ঃ ১। ঘ ২। গ ৩। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.২ ঃ ১। গ ২। ঘ ৩। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৩ ঃ ১। গ ২। ক ৩। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৪ ঃ ১। গ ২। খ ৩। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৫ ঃ ১। গ ২। ক ৩। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৬ ঃ ১। গ ২। ঘ ৩। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৭ ঃ ১। ঘ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৮ ঃ ১। ঘ ২। গ ৩। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৯ ঃ ১। ঘ ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১০ ঃ ১। খ ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১১ ঃ ১। খ ২। ঘ ৩। গ